ভারতের বনসংরক্ষণের ইতিহাস

অশেষ লাহিড়ী

(প্রাক্তন মুখ্য বনাধিকারিক ও রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বিশেষজ্ঞ সদস্য)

সাধারণভাবে অরণ্যের সঙ্গে বেশি মানুষের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। যদিও স্কুল কলেজের বইতে যতটুকু জানা যায় তার থেকে সম্যক ধারণা করা অনেকাংশেই সম্ভব নয়। যদিও বৈদ্যুতিন ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম মারফৎ স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বনের খবর পাওয়া যায় তথাপি তার থেকেও প্রকৃত অবস্থা বা সমস্যার মূল সূত্রের অনুমান করা সম্ভব হয়না। এই কথা স্মরণে রেখে এই নিবন্ধে ভারতে বিভিন্ন যুগে। প্রাচীন ভারত, মোগল আমল, ইংরেজ শাসন ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা, বনজ সম্পদের ব্যবহার, সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। এবং বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উষ্ণায়নের সমস্যা দেখা দিয়েছে তারই সঙ্গে অরণ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা বিষয়ে কিছু তথ্যের উল্লেখ

করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাঁরা বনকে ভালোবাসেন বা জাতীয় উদ্যান, ইকোটুরিজম স্পট, বায়োস্পোর রিজার্ভ তৈরি হওয়ায় বেড়াতে যান যার ফলে বনের ভিতরে দেখার সুযোগ হয়েছে, তাঁর ধারাবাহিক ইতিহাস থেকে বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করতে পারবেন কারণ বনসংরক্ষণের জন্য এটা একান্ত অপরিহার্য।

ভারতীয় সভ্যতায় বৈদিক যুগের অরণ্যের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মুনি ঋষিরা হলেন ভারতীয় দর্শনের স্রষ্টা। অরণ্যের নির্জনতায় তাঁদের নিরন্তর চিন্তার ফসল বেদ, বেদান্ত, উপনিষদের মতো গ্রন্থ। ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক গৌতম বুদ্ধ। তিনি বোধিবৃক্ষের নিচে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর কথায় 'দয়া' ও ঔদার্যের প্রতীক অরণ্য এমনি একটি সৃষ্টি যা নিজের জন্য কোন কিছু দাবি করে না, কিন্তু অন্যসব প্রাণীজগৎকে রক্ষা করে। এমনকি যে তাকে ধ্বংস করে তাকেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ছায়া দান করে।' সুদূর অতীতে রাজস্থানের মরু অঞ্চল ও পঞ্জাবের কোন কোন অংশ ছাড়া সারা দেশই অরণ্যে ঢাকা ছিল। গঙ্গা, সিন্ধু উপত্যকায় যেখানে এখন বনভূমির চিহ্ন দেখা যায় না সেখানে বনভূমির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০-৩০০০ অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যায় মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা সভ্যতা গড়ে ওঠে, ফলে পঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাটের ব্যাপক অরণ্য ধ্বংস হয়। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে খ্রিস্টপূর্ণ ২০০০ থেকে ১৮০০ অব্দের মধ্যে। বলাবাহুল্য তাদের জীবন ও জীবিকার পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতের অনেক বনভূমি গোচারণ। চাষের জমিও বসতিতে রূপান্তরিত হয়। যদিও আর্যরা বন ও বনসম্পদের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন যা ঋগ্‌বেদ ও অন্যান্য প্রাচীন পুথি থেকে জানা যায়। তারা বিভিন্ন রকম গাছগাছড়া থেকে ঔষধি সংগ্রহের উপরে নজর দেন, যার উল্লেখ চরক ও সুশ্রুত সংহিতা বা বাল্মীকির রামায়ণে আছে যার ফলশ্রুতি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। এইসঙ্গে তাঁরা কৃষিব্যবস্থা শুরু হবার পর থেকে গ্রামের পাশে তপোবন, প্রাকৃতিক বন বা মন্দিরের পাশে পঞ্চবটি রাখার বিধান দেন। এছাড়া বিভিন্ন দেবদবীদের পূজায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে নানাপ্রকার গাছের পাতা, ফল, মূল, ফুল ইত্যাদি ব্যবহার প্রথা প্রবর্তন করেন যা এখনও পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত আছে।

ভারতের আদিম অধিবাসীরা বন থেকে বিভিন্ন খাদ্য, ঔষধি সংগ্রহ করত। সামাজিক অনুষ্ঠানে, পূজাপার্বণে অরণ্যের উদ্ভিদের ব্যবহার করত। এখনও তা বর্তমান। এমনকি কোন কোন আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের গ্রামের পাশে প্রাকৃতিক বনসংরক্ষণ করত যা পবিত্র বন (Sacred Grove) নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দে মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের পরে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তর আমলে চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বন পরিচালনা করার সবিশেষ উল্লেখ আছে। তিনভাবে অরণ্য ব্যবহারের কথা তিনি নির্দেশ করেন। (১)

বনজ দ্রব্য আহরণের জন্য বন, (২) হাতি বা তৃণভোজি প্রাণীর জন্য বন ও (৩) রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শিকারের জন্য বন। এছাড়া বন পরিচালনার জন্য বনরক্ষী ও উচ্চপদস্থ কর্মী নিয়োগের উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোকের কালে ছায়া, ফল ও ঔষধির জন্য পথের ধারে বৃক্ষরোপণের নির্দেশিকা ছিল, অশোকের শিলালিপি তার নিদর্শন। ৭০০ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আমলে বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা'য় জল সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণের উল্লেখ করেন। তিনি জলাশয়ের ধারে অশথ, বট, অর্জুন, তাল, জাম, বকুল, মহুয়া, ইতাদি বৃক্ষরোপণের কথা লেখেন।

সুপ্রাচীন এই দেশে বহুজাতির মিলনে সৃষ্টি হয়েছে এক সুমহান সভ্যতা। তবে অরণ্য সংরক্ষণের প্রযোজনীয়তা ও অরণ্যের প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ সবার সমান ছিল না। ভারতে মোগলদের প্রবেশ ঘটে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধের বছর। বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর প্রমুখ মোগল সম্রাটদের রচিত 'বাবরনামা', 'হুমায়ুননামা' প্রভৃতি গ্রন্থে এদেশের অরণ্য ও বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাটদের শিকারের শখ ছিল। বাবরের সময়ে উত্তর ভারতে সিংহ দেখা যেত। এমনকি পশ্চিম হিমালয়ের পাদদেশে গণ্ডার, বাইসন, হাতি ইত্যাদি ছিল। সম্রাট আকবরের সময় শিকারের জন্য ১০০০ চিতা রাখা ছিল। বর্তমান ভারতে চিতা অবলুপ্ত প্রাণী। ইহা ছাড়া রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ও জনসংখ্যার চাপে উপযুক্ত উর্বর বনভূমি অঞ্চল কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল যেমন সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চল। যা পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসনের আমলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যও পর্তুগীজ জলদস্যু দমনের জন্য সুন্দরবনের বিপুল এলাকায় বহিরাগতদের নিয়ে এসে বসতি করা হয় ফলে সুন্দরবন সংকুচিত হয়। এবং তৎকালীন পদস্থ কর্মচারীদের চেষ্টায় বর্তমান সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বন রক্ষা হয়।

সম্রাট শেরশাহ পাঁচ বছরের রাজত্বকালে বাংলা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ করেন তার দুপাসে ছিল বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা। মোগল বাদশাহের বাগানের শখ ছিল। সুন্দর সুন্দর উদ্যান গড়ে তোলেন তাঁরা। কাশ্মীরের মোগল গার্ডেন তারই নিদর্শন। এখানে যেসব বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল চিনার। সম্রাট জাহাঙ্গীর পারস্য (ইরান) থেকে এই গাছ আনিয়ে ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন ফল চাষেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার মধ্যে আম অন্যতম। সংক্ষেপে বলা যায় বৈদিকযুগ থেকে মোগল আমল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বনের পরিবর্তে জীবিকার জন্য উপযুক্ত উর্বরজমি কৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং তার থেকে স্থানীয় মানুষ নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন, ঘরবাড়ি তৈরি করার কাঠ, জ্বালানি, পশুখাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। আর শাসকশ্রেণির রাজপুরুষদের কাছে বন ছিল শিকারস্থল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার (ওড়িশা) দেওয়ানি লাভ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। পরে ১৭৬২তে এলাহাবাদ পর্যন্ত দখলে আসে।

কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য নীল, তুলা, আফিম প্রভৃতি অর্থকরী রপ্তানিযোগ্য ফসলের জন্য বনভূমি ক্রমশ কৃষিভূমিতে পর্যবসতি হয়। তারই অবশ্যম্ভাবি ফলশ্রুতিতে গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে অরণ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। ব্যবসা ও যুদ্ধের প্রয়োজনে যে কাঠের দরকার ছিড় তা ওই অঞ্চলের বনভূমিতে পাওয়া যেত না। এমনকি রপ্তানির জন্য কাঠের বাক্সের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল। সেজন্য জাহাজ তৈরির উপযোগী মেহগিনি কাঠ আমদানি করতে হত সুদূর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের জামাইকা থেকে। আর প্যাকিং বাক্সের কাঠ সংগৃহীত হত নেপালের তরাই অঞ্চল থেকে। ১৭৮৭ সালে শিবপুর বটানিকাল গার্ডেন স্থাপিত হলে অর্থকরী ফসলে পরীক্ষামূলক চাষের সঙ্গে সঙ্গে জামাইকা থেকে মেহগিনি গাছের বীজ এনে বপন করা হয়। যার নিদর্শন এখনও সেখানে রয়েছে। ১৭৯৯ সালে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের পতনের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ ভারত দখল করে। এই অঞ্চলের বনভূমিতে জাহাজ তৈরির উপযোগী সেগুন কাঠের সন্ধান পাওয়ায় কয়েকজন মিলিটারি অফিসার নিযুক্ত করা হয়। সেইসঙ্গে সেগুন কাঠের প্রাকৃতিক বনের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রিটিশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর থেকে নৌশক্তি বৃদ্ধি ও পণ্যপরিবহনের জন্য যথেচ্ছভাবে এই সেগুন বনের গাছ ব্যবহার শুরু করে। নির্বিচারে সেগুন গাছ কাটা বন্ধ করার জন্য অচিরে আইন প্রণয়ন করা হল এবং নিযুক্ত হলেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারি। কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়। এইসময়ে বন পরিচালনার জন্য কিন্তু ১৮৪৬ সালে প্রথম কৃত্রিম সেগুন বন সৃজন করেন মালাবারের ডিস্ট্রিক কালেক্টর কেরলের নীলাম্বুরে। তাঁকে সাহায্য করেন তাঁর সহকারী ছট মেনন। এছাড়া ১৮৫৮ সালে জ্বালানি কাঠের অভাব দূর করতে প্রথম ইউক্যালপটাস চাষ শুরু হয়। এখন উটিতে যে ইউক্যালপটাস বন দেখ যায় তার শুরু সেই কোম্পানির আমলে। এইরকম প্রয়োজনমাফিক প্রধান ও কেন্টমেন্ট সেনাশিবিরের কাছাকাছি জ্বালানি কাঠের জন্য বনসৃষ্টির উদ্যোগ দেখা যায়। এদিকে ১৮৫০ সালে এডিনবরার ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের হিউক্লেগহর্ন (যিনি দক্ষিণ ভারতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন) তিনি কোম্পানির অধিকৃত ভারতেও প্রথম ব্রিটিশ-বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার) ১৮২৫ সনের যুদ্ধে অধিকৃত অঞ্চলের বনের অবস্থা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে (১৮৪৭-৫১) বিখ্যাত গ্রন্থ 'Flora of British India'-র লেখক প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ ড. হুকার (Hookar) যিনি বিউগার্ডেনের ডিরেক্টর ছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হন। ইংরেজরা সমসাময়িক সময়ে বর্মার নিম্নভাগে পেগু অঞ্চলে সেগুনের সন্ধান পায় এবং কোন এক অন্যায় অজুহাতে ১৮৫৩ সালের ৩ জুনের যুদ্ধে সেগুন সমৃদ্ধ এই বনাঞ্চল দখল করে নেয়। কথিত আছে প্রথম বার্মাযুদ্ধের অধিকৃত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জুডো পরে বুদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করায় অপমানিত হন

এবং এরই প্রতিশোধ হিসেবে বার্মার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই অঞ্চল দখলের পর তা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। রেঙ্গুন শহরও অধিকার করেন ব্রিটিশ শাসক। বর্মার পূর্ব অধিকৃত অঞ্চলের তদারকির জন্য নিযুক্ত জন ম্যাকলিল্যান্ড তদানিন্তন সুপারিনটেনডেন্ট অপরিকল্পিতভাবে বন ব্যবসায়ীদের দ্বারা কাঠ কাটার ফলে এই অংশের সেগুন বন ধ্বংসের রিপোর্ট পাঠালে তা নিয়ে এডিনবরা ব্রিটিশ এসোসিয়েশেনে আলোচনা হয়। বনের সকল তথ্য এবং অবিলম্বে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়টি তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড ডালহৌসিকে জানান হয়। তিনি ব্রিটেনস্থ ভারত বিষয়ক সেক্রেটারি অফ স্টেটস্‌কে বনের অবস্থার চিত্র ও সংরক্ষণের প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিশেষভাবে আলোচিত হবার পর ভারতের বনসংরক্ষণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অর্থবরাদ্দ বনজদ্রব্য বিপণনের মাধ্যমে ব্যবহার নির্দেশ থাকে।

১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসির কার্যকালের শেষভাগে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার লেকচারার ড. ব্র্যান্ডিস বর্মার পেগু অঞ্চলের বন সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে জার্মানি কাঠের সরবরাহ চিরায়ত করতে বিজ্ঞানভিত্তিক বন পরিচালনার কাজ শুরু করে। একমাত্র ফ্রান্স ছাড়া ব্রিটেন, পর্তুগাল, স্পেন ইত্যাদি সমুদ্র তীরবর্তী দেশে উপযুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনার অভাবে সেই অঞ্চলের বনভূমিতে জাহাজ তৈরির উপযুক্ত ওক কাঠ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় এজন্য জাহাজ তৈরির উপযোগী ওক কাঠ ছিল জার্মানির প্রধান রপ্তানি পণ্য।

ড. ব্রান্ডিস কলকাতা পৌঁছন ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। পরের বছর জানুয়ারিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ কর্মস্থলে যোগ দেন। তিনি পেগুর বনাঞ্চল পরিচালনার উদ্দেশ্যে একাধিক লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেন নিম্নরূপভাবে ১) বনরক্ষা করা ও যতদূর সম্ভব তার উন্নতি করা, (২) বনের আদিবাসীদের সহযোগিতা অর্জন করা, (৩) সেগুন কাঠের উৎপাদন চিরায়ত করা বেং (৪) বনসংরক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় করা। পেগুর দায়িত্ব নেবার একমাসের মধ্যে পাহাড়, উপত্যাকা ও সমতলের সমস্ত বনভূমি পায়ে হেঁটে চারমাসের অধিক সময় ধরে পরিদর্শন করে সেগুন গাছের ঘনত্ব নিরূপণ করেন তিনি। এই সমীক্ষা থেকে জানা যায় বনের সবরকম গাছের মধ্যে ১০%-২০% সেগুনের অস্তিত্ব রয়েছে এখানে। এরপরেই সমগ্র বনাঞ্চল পুরোপুরি সরকারের অধীনে আনার ব্যবস্থা করেন। আগে বনের অধিকারী ছিলেন রাজা। জনসাধারণ বা কোন জনগোষ্ঠীর কোন অধিকার ছিলনা। ড. ব্রান্ডিস জানতেন যে বন থেকে আয় না হলে বন পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তাই তিনি নিয়মিত আয়ের জন্য একটি ফরমূলা পেশ করেন। এই ফরমূলা 'ব্রান্ডিস ফরমূলা' নামে

পরিচিত। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সেগুন গাছ যার সংখ্যা নির্ণয়, উপযুক্ত মাপের সেগুন গাছ সংখ্যা, ভবিষ্যৎ গাছের সংখ্যা, কতদিনে গাছগুলি কাটার উপযোগী হবে, এবং ক্রমে কতগুলি গাছ উপযুক্ত মাপের গাছ হয়ে উঠবে তার একটা শতকরা হিসেব দেওয়া আছে। এই ফরমূলার সাহায্যে উপযুক্ত গাছ কাটার সংখ্যা নির্ধারণ করার ব্যবস্থা করেন যাতে কাঠের যোগান বা সরবরাহ চিরায়ত করা যায়।

এইভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ গাছ কাটার আগে গাছের গোড়ায় বেষ্টনী করে রাখতেন (girdles) যাতে গাছটি ক্রমশ শুকিয়ে যায় তারপর কেটে ছোট ছোট লগ করে হাতির সাহায্যে নদীর ধারে এনে জলে ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয় গন্তব্যস্থানে চালান করার জন্য। বার্মার রাজার আমলে এইভাবে কাঠ সংগ্রহ পদ্ধতি চালু ছিল। বনের ভিতর যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় হাতি, মহিষ ইত্যাদি পশুদ্বারা কাঠ সংগ্রহ করে নদীপথে কাঠ সরবরাহ ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন স্থানে চালু হয়।

বন কেটে জুম চাষ ছিল পেগু অঞ্চলের স্থানীয় জনজাতি কেরেনদের জীবনধারণের পদ্ধতি। একে স্থানীয় ভাষায় 'টংগিয়া' বলা হত। ড. ব্রান্ডিস তাঁর স্থানীয় সহকারীর সাহায্যে এই জুমচাষের সঙ্গে সেগুন গাছ রোপণের নিয়ম করে কৃত্রিম সেগুন বন সৃষ্টি শুরু করেন। ১৮৫৬ সালে প্রথম কৃত্রিম সেগুন বন সৃষ্টি শুরু হয় 'টংগিয়া' চাষের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইভাবে কৃত্রিম বনসৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছিল যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে কৃত্রিম শাল বন সৃষ্টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরফলে নিখরচায় কৃত্রিম বন সৃষ্টির যে পদ্ধতির উদ্ভব হয় তা 'টংগিয়া সিমটেস" বলে পরিচিত। এরফলে পরবর্তীকালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বনের কাজ করার জন্য আদিবাসী বস্তি গড়ে ওঠে এবং তাদের ধানচাষের জমি ও বাসস্থানের পরিবর্তে ১৮০ দিন বিনামূল্যে বনের কাজ যেমন, কৃত্রিম বনসৃজন, অগ্নিনির্বাপণের কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সেগুন গাছ কাটার জন্য চাপ সৃষ্টি হয় যা ব্রান্ডিস প্রতিরোধ করেন অবশ্য পরে সরকার পুনরায় গাছ কাটার অনুমতি দেয় কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। এখানে উল্লেখ্য ১৮৫৬-৫৭ সালে বর্মার সেগুন বন থেকে আয় হয় ২.০৮ লক্ষ টাকা এবং প্রতি টনের মূল্য ছিল ৪০ টাকা (৫০ ঘনফুটের মূল্য)।

একদিকে ভারতে রেলপথের সূচনা হয় ১৮৫৩ সালে। প্রথমে বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে থানে পর্যন্ত রেল চলে। ক্রমে বরদা, মধ্যভারত, পঞ্জাব ইত্যাদি জায়গা থেকে তুলো আমদানি করার জন্য রেললাইন পাতার কাজ জরুরি হয়। ১৮৬০-১৯১০ সাল পর্যন্ত এদেশে রেললাইন তৈরি হয় ১৩৪৯ কিলোমিটার থেকে ৫১৬৫৮ কিলোমিটার এবং পরে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিকল্পনাহীন গাছকাটার ফলে বনসম্পদ ধ্বংস হয় যথেষ্ট পরিমাণে, তাই ভারত সরকার ১৮৬৪ সালে ড. ব্রান্ডিসকে অরণ্য

বিভাগের প্রধান ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট নিযুক্ত করেন। ঐ বছর দু'জন জার্মান বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম সিলিপ ও রবিন ট্রপ তাঁর সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৬৭ সালে ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিস ও পুলিশ সার্ভিসের মতো ফরেস্ট সার্ভিস গঠন করা হয়। ঐ সার্ভিসে অফিসার জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে ট্রেনিংয়ের পর ভারতের বিভিন্নস্থানে কাজে যোগদান করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসর প্রাপ্তরা এই সার্ভিসে যোগদান করেছিলেন। পরে ভারতীয়দের যোগদান সম্বন্ধে আইন শিথিল হলে ভারতীয় অফিসাররাও যোগদান করেন। যেহেতু বনবিভাগের পদের জন্য বিশেষ পারদর্শিতা ও গভীর বনের ভিতর কাজ করার জন্য শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল সেজন্য ইম্পিরিয়াল সার্ভিস ছাড়া প্রাদেশিক সার্ভিস। ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার প্রভৃতি পদে চাকুরিতে প্রবেশের পূর্বে তাদের ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথা এখনও পর্যন্ত চালু আছে। ১৮৭৮ সালে ভারতে প্রথম রেনজার্স (Rangers) কলেজ দেরাদুনে খোলা হয়। ১৯১২ সালে প্রাদেশিক অফিসারদের ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি তদানীন্তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ড. এন্ডারসন (Dr. Anderson) বনপাল হিসেবে যোগদান করেন। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং পূর্বে তিনি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন।

ভারতে বনপরিচালনার শুরতে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে এবং পরে ১৮৭৮ সালে প্রথম অরণ্য আইন প্রণয়ন হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ ধারানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে সংরক্ষিত বন সৃষ্টি শুরু হয়। যদিও ইতিপূর্বে ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ কলোনিয়াল প্রশাসন আর্ডিনেন্স বলে ব্রিটেনের এশিয়ার বন, পতিত জমি ও অধিকৃত জমি ব্রিটিশরাজের দখলে আসে। ১৮৯৭ সালে প্রথম বননীতিতে বনের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিরায়তভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ থাকে। এই নীতিতে উপযুক্ত জমিকে কৃষি কাজের জন্য ব্যবহার করা ও কৃষির উন্নতির ব্যাপারে বনরক্ষার গুরুত্ব অর্পণ করা হয়। এ বিষয়ে বিখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ ড. ভোলকারের বিশেষ অবদান ছিল।

মূল্যবান প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিক কাঠের উৎপাদন চিরায়ত করার লক্ষ্যে বন আইনের মাধ্যমে বন পরিচালনা নীতি গৃহীত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় ১৮৭৮ সালে ভারতে মোট সংরক্ষিত বন ছিল ১৪০০০ বর্গমাইল যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০০ সালে হয় ৮৪৭০০ বর্গমাইল। এই সমস্ত বন সমীক্ষা করে সীমানা নির্দেশক (বাউন্ডারি পিলার) দিয়ে চিহ্নিত থাকে এবং বন-আধিকারিকের বিনানুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিছু কিছু সংরক্ষিত বনে জনসাধারণের অনুমতি সাপেক্ষে প্রবেশাধিকার থাকে। ড. ব্রান্ডিস গ্রামের কাছে বনভূমি সৃজনের কথা বললেও তা কার্যকরী হয়নি।

এইসব সংরক্ষিত বনে বিশেষ বন-আধিকারিক বনের গাছপালার হিসেব করে গাছকাটা, পরিচর্যা, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বন তৈরি করার বিষয়ে পরিকল্পনা

করে যাতে বন থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঠের উৎপাদন চিরায়ত করা যায় বনের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায় সেবিষয় সচেষ্ট হন। এছাড়া বন সংলগ্ন গ্রামবাসীদের বনজ দ্রব্য ও জ্বালানি কাঠের সরবরাহ বিষয়ে কিছু নিয়মবিধি নির্ধারণ করেন।

ভারতের পূর্ব, মধ্য, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে দামী কাঠ যেমন, শাল, সেগুন, দেওদার, পাইন ইত্যাদি গাছের জন্য সংরক্ষিত বন সৃষ্টি হলেও উত্তর- পূর্ব অঞ্চলে বর্তমান মেঘালয়, মিজোরাম, অরুণাচল ও অসমের কিছু অঞ্চলে বন স্থানীয় আদিবাসীদের অধীনে থাকে। কিন্তু মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে কোন কোন স্থানে অরণ্যের আদিবাসীরা সংরক্ষিত বন করার কালে তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে সেইসময় কিছু আন্দোলন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি ১৮৬৫ সালে পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে তরাই ও ডুয়ার্সের (বর্তমান উত্তরবঙ্গে অবস্থিত) শাল সমৃদ্ধ বন ব্রিটিশ শাসনে আসার পর সংরক্ষিত বন সৃষ্টি হয় আর অপেক্ষাকৃত ফাঁকা ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা জমি পরিষ্কার করে ১৮৭৪ সাল থেকে চা বাগান সৃষ্টি শুরু হয়। এই অঞ্চলে বিশেষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ না থাকায় পূর্ব ভারতের বর্তমান ঝাড়খণ্ড থেকে আদিবাসী সম্প্রদাযের মানুষকে চা বাগান ও বনবিভাগের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করে চা বাগানে ও বনবস্তি গড়ে ওঠে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ও অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই সমস্ত শ্রমিকের কাজেও নিযুক্ত হন।

বর্তমান দার্জিলিং জেলার দার্জিলিং ও কার্শিয়াং ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিকিমের কাছ থেকে পায় ও সেখানে শৈলবাস ও সেনা ছাউনি হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। ১৮৩৫ সালে এখানে প্রথম চা বাগান শুরু হয় এবং ১৮৬৫ সালে পাহাড়ি বনভূমি সংরক্ষিত বন হিসেবে মর্যাদা পায়। দার্জিলিং পাহাড়ে যে ধুপী গাছ দেখা যায় সেটা একটা জাপানী গাছ (Crypto merie Japonica) যার বীজ চায়না থেকে এনে লাগান হয়েছিল, চায়ের বাক্স বানাবার জন্য ১৮৬৪ সনে। বন সংরক্ষণ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ কাঠ সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়। সাধারণভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বনের মধ্যে রাস্তাঘাট বিশেষ না থাকায় হাতির সাহায্যে বা গরু, মহিষের দ্বারা এমনকি দুর্গম বনাঞ্চলে অস্থায়ী লাইন পেতে কাঠ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হত। স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী কাঠের দরকার হত। যা সহজেই অস্থায়ী রেললাইন বসাতে স্বল্পায়াসে জোগাড় করা হত। কয়লা ব্যবহার শুরু হবার আগে এবং প্রথম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বনভূমি থেকে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সাধারণত চেরাই করার উপযুক্ত মোটা দাঁড়ান সোজা লম্বা নির্দিষ্ট গাছ কাটার জন্য থাকে যা নিলাম বা লিজের মাধ্যমে কিনে ঠিকাদাররা বন থেকে নিয়ে এসে করাত কলে চেরাই করে সরকারকে নির্দিষ্ট রেলওয়ের জন্য স্লিপার সরবরাহ করতেন। এই ব্যাপারে অনেক অঞ্চলে বনের ঠিকাদারদের কাঠ সংগ্রহের জন্য ডিপো ও কল স্থাপনের জন্য সরকার বনের পাশে

নামমাত্র খাজনায় জমি দিতেন। যেখানে নদী আছে সেখানে কাঠের ভেলা বেঁধে জলে ভাসিয়ে কাঠ সংগ্রহ করা হত। তারপর সুবিধা মতো উপযুক্ত জায়গায় শহর বা বন্দরের কাছাকাছি সেইগুলি আটকানোর ব্যবস্থা হত। সেখানে থেকে কলে চেরাইয়ের জন্য পাঠান হত।

সেগুন ছিল সবচেয়ে দামী কাঠ এজন্য চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি কিন্তু পূর্বভারতে প্রাকৃতিক সেগুন না থাকায় সেগুনের উপযুক্ত জমিতে যেমন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বামন পুকুরি, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কাপতাই, অসমের কামরূপের কুলশীবা ওড়িশার আঙুলের মত বনাঞ্চলে পরীক্ষামূলক কৃত্রিম সেগুন বন সৃষ্টি শুরু হয় ১৮৬৭ সালে থেকে এই প্রয়াস সফল হবার পর পূর্ব ভারতে বিভিন জায়গায় বিশেষতঃ স্বাধীনতার পর থকে ব্যাপকভাবে সেগুনের চাষ শুরু হতে থাকে।

১৯০৬ সালে দেরাদুনে ভারতীয় বন-অনুসন্ধান শাখা স্থাপন করা হয়। ঐ গবেষণা সংস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক বন সংরক্ষণের নানা গবেষণা শুরু করে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে বটানিলক্যাল সার্ভে, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সৃষ্টি হবার আগে এই সংস্থাই অনুসন্ধান কাজ শুরু করে। বিভিন্ন প্রাণী ও গাছপালা বিষয়ে গবেষণা টিম্বার গাছের যেমন শাল, সেগুন, দেওদার ইত্যাদি প্রাকৃতিক বন সৃষ্টির উপায়ে এবং কৃত্রিম বনসৃজনের ব্যাপারে এই সমস্ত গাছের বয়স ও আকার (সাইজ) অনুসারে টিম্বার ও ছোট কাঠ উৎপাদন ক্ষমতা স্থির করা হয় যাতে গাছ না কেটে তার উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করা যায় যা (yield table) বলে পরিচিত। এছাড়া ক্রমবর্ধমান স্লিপারের চাহিদা বা বিভিন্ন কাঠের চাহিদা মেটানোর জন্য ভারতীয় বনে বিভিন্ন কাঠের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং উপযুক্ততা নির্ণয় করা। কারণ শাল, সেগুন বা দেওদারের মতো মূল্যবান কাঠের সীমিত যোগানে ক্রমবর্ধমান স্লিপারের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় রেল লাইন বিস্তারের জন্য প্রয়োজন প্রতি বৎসর দশ লক্ষ স্লিপার যা পূর্ব ভারতের শাল, দক্ষিণ ভারতের সেগুন বা পশ্চিম হিমালয়ের দেওয়ার থেকে পূরণ হওযা সম্ভব ছিল না। ক্রমে গবেষণার ফলে উপযুক্ত উপায় বের করে অনেক বনের অপরিচিত গাছের কাঠ স্লিপার হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। এবং উত্তরোত্তর গবেষণার ফলে বিভিন্ন গাছের কাঠের গুণাগুন বিচার করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার ও বনজ কাঁচামালের ভিত্তিক শিল্প স্থাপনা করা যায়। তাদের গুণাবলী বৃদ্ধি করে উপযোগী করার ব্যবস্থা হয়। এই অনুসন্ধানশালা থেকে বাঁশ ও অন্য বনজ দ্রব্য থেকে কাগজ উৎপদান বিষয়েও পরীক্ষা হয় যা স্বাধীনতার পরে বিদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য যেমন— কাগজের জন্য কাঠের মণ্ড নিয়ে আসার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ হয়, ফলে কাগজ, নিউজ প্রিন্ট ইত্যাদি দেশের তৈরি হবার ব্যাপারে পরিকল্পনা শুরু করার জন্য কাঁচামাল যোগানের অবস্থা বিচার করার বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা করে যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় ক্রমশ শিক্ষিত জনসংখ্যা

বৃদ্ধির চাহিদা দূর করতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ তৈরির উপযুক্ত নরম কাঠের প্রয়োজন যা ভারতের বনে অতি অল্প পরিমাণে আছে। মনে রাখা দরকার ভারতের বেশিরভাগ অরণ্যে নানাপ্রকার গাছ জন্মালেও তার অধিকাংশই দ্রুত বর্ধনশীল নয় এবং কাগজ উৎপাদনের জন্য বিশেষ গুণ নেই, যেমন লম্বা আঁশ (Long Fibre) কেবলমাত্র বাঁশ, বাবুই ঘাস ইত্যাদি ছাড়া। এজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কাগজ তৈরির উপযুক্ত দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানোর প্রচেষ্টা শুরু হয় বিগত ছয়ের দশক থেকে। তখন থেকেই শুরু হয় ইউক্যালিপটাসের আমদানি। নিউজপ্রিন্ট তৈরি করার জন্য নেপানগরে মিল স্থাপন করে মধ্যপ্রদেশের বনের নিউজপ্রিন্টের উপযুক্ত গাছ (সাবাই) ব্যবহার করে উৎপাদন শুরু হয় সেইসঙ্গে বন গবেষণা কেন্দ্রে বিভিন্ন Tropical Pine ও অন্যান্য দ্রুত বর্ধনশীল গাছের পরীক্ষামূলক চাষ শুরু হয়।

সাতের দশকের গোড়ার দিকে বনজসম্পদ ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতের বনজ সম্পদের সমীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় বনবিভাগ 'Pre-investment Survery' বলে একটি সংস্থা গঠন করেন। এরই ফলে aerial photography মারফৎ ধরনের সমীক্ষা শুরু হয়। এই সংস্থার কাজের মাধ্যমে বনের বিভিন্ন প্রকার কাঠ জাতীয় পণ্যের অবস্থা ও পরিমাণ ইত্যাদি সম্যক জানা যায় এবং তার ফলশ্রুতিতে বনভিত্তিক শিল্পস্থাপনের পথ সুগম হয়। এই সংস্থা প্রথমে বনসম্পদ সমীক্ষার জন্য কাজ শুরু করলেও বর্তমানে দেশের বনের আয়তন বৃদ্ধি বা সঙ্কোচন ব্যাপারে Remote Sensing প্রযুক্তির সাহায্যে নিরূপন করে প্রতিবছর বনের অবস্থা ও পরিমানের হিসেব দেয়। যেমন ২০১৪-১৫ সনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের বনের বর্তমান আয়তন ৭০১, ৬৭৩ বর্গ কিলোমিটার। এছাড়া বনের ঘনত্ব ফাঁকা জমির পরিমাণ ইত্যাদি জান যায় তার থেকে বন পরিচালনা পরিকল্পনা করা হয়। বনবিভাগের এই সংস্থার প্রধান অফিস দেরাদুনে এবং প্রত্যেক জোনে জোনাল অফিস আছে। পূর্বাঞ্চলের অফিস কলকাতায়।

সালের দশকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশে জাতীয় কৃষি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ভারতীয় বনের উৎপাদন শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও জনসাধারণেৰ গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। (১) সংরক্ষিত বনসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও (২) বনের বাহিরে অব্যবহৃত কৃষিজমিতে রাস্তার ধারে ব্যক্তিগত জমিতে বনায়ন করার ব্যবস্থা যাতে গ্রামবাসীদের বন তৈরি কৃষি ও যন্ত্রপাতি, গো-খাদ্য ও জ্বালানি কাঠের চাহিদা মেটাতে পারে। এই ব্যবস্থা সামাজিক বনসৃজন বা 'Soical Forestry' বলে পরিচিত।

১৯৭৬ সালে এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বনের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমাজভিত্তিক বনসৃজনের পরিকল্পনা শুরু হয়। বনবিভাগের বাজেটে পরিমিত অর্থ না থাকায এই সব কর্মকাণ্ডের জন্য প্রথমত বনের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য

substanital finance পাবার জন্য Forest Corporation গঠন করা হয় ফলে প্রতি রাজ্যের কিছু অংশের বনভূমিকে Corporation-এর অধীনে পরিচালনার জন্য আনা হয়। সামাজিক বনসৃজনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক ও সুইডেন, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়া শুরু হয়।

প্রাচীন বন কেটে বনায়ন করার কাজ প্রধানত Forest Corporation-এর উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যেখানে প্রাচীন বন (১০০-১৫০ বছরের) থেকে ১০০ থেকে ২০০ ঘনমিটার (প্রতি হেক্টর) কাঠ বা জ্বালানি পাওয়া যায়, সেই গাছ কেটে নতুন বন সৃষ্টি করে (plantation) ৩০ থেকে ৬০ বছরে হেক্টর প্রতি ৬০০ ঘনমিটার কাঠের সংস্থান হতে পারে। সাধারণভাবে বনের ভিতর যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্গম বন থেকে কাঠ আহরণ করা খুব অসুবিধা ছিল এবং অনেক কাঠ নষ্ট হত, সেজন্য কর্পোরেশন তৈরি হবার পর সে বিষয়েও নজর দেওযা হয় ফলে রাস্তা নির্মাণ, কেবিল ক্রেন ব্যবহার ও পাওয়ার চেন করাত ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বনের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও বনজ শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ ইত্যাদি কাজের অগ্রগতি হয় এবং বিস্তীর্ণ পতিত ভূমি ও অবক্ষয়ী বনভূমিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে বনায়ন করা শুরু হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক উপায়ে মূল্যবান গাছের উৎপাদন চিরায়ত করার বা কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবান গাছের চাষ ও পরিচালনা করার বিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক বন বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা হয়। এই গবেষণা ফল ট্রপিক্যাল বন পরিচালনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয় যা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

প্রত্যেক জাতীয় প্রাকৃতিক বনের কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয় বিশেষ বিশেষ প্রাণী সংরক্ষণের জন্য Sanctuary সৃষ্টি করা শুরু হয়েছিল যেমন কাজিরাঙা, জলদাপাড়া, গির ইত্যাদি। হাতি ও গন্ডার সংরক্ষণের বিশেষ আইন ও যথেষ্ট প্রাণী শিকার প্রতিহত করার জন্য সুটিং ব্লক, close season ইত্যাদি মাধ্যমে শিকার সীমিত রাখার চেষ্টা হয়। যদিও ইংরেজ শাসনের শুরুর দিকে বিশেষতঃ বন্দুক ব্যবহার চালু হবার পর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ যথেচ্ছ শিকার করতেন। যাইহোক বিশেষ প্রাণী সংরক্ষণের জায়গায় সমস্ত বন্যপ্রাণীর অবস্থান অনুযায়ী সংরক্ষণের আইনগত ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় বনের পরিচালনা পদ্ধতি একইভাবে চলতে থাকে, সেইসময় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যের সংস্থান বাড়াতে কৃষির উপর জোর থাকায় বড় বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Hydal Project) যেমন, ভাকরা-নাঙ্গাল,

দামোদর ভ্যালি ইত্যাদি শুরু হয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রকল্পে জনবিভাজিকা বনভূমি না থাকায় ক্রমে এইসব বিদ্যুৎ প্রকল্পে পলি পড়ার (Siltation) সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং পরবর্তীকালে ছয়ের দশক থেকে মাটি জল সংরক্ষণের জন্য বনসৃজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেশের শিল্পাঞ্চল গড়া, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, প্রতিরক্ষা, কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রগতিমূলক উন্নয়ন স্বার্থে বনভূমি ও অব্যবহৃত পতিত জমি ব্যবহার হতে থাকে।

১৯৫২ সালে স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম বননীতি প্রণয়ন করা হয়। এতে সমতলভূমির ৩৩% জমিতে ও পাহাড়ে ৬৬% জমিতে বনভূমি রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া এই নীতি অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানাধীন বন সরকারে ন্যস্ত হয়। মাটির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বনভূমি বনসম্পদের উপর জোর দেওয়া হয়। বনবিভাগের হাতে আসায় ঐ বন ক্রমশ সংরক্ষিত বন হিসেবে গণ্য হয়। এবং পরিকল্পনা মাফিক পরিচালনার কাজ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৯৫৩ সালের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যে বিস্তীর্ণ বনভূমি 'জমিদারি বন' বলে চিহ্নিত ছিল পরে সেগুলি সংরক্ষিত বন হিসেবে পরিগণিত হয়। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বন ভারতীয় বন আইন প্রয়োগ করে সরকারি আওতায় এনে সংরক্ষণের জন্য পরিচালনা শুরু করে বনবিভাগ। ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়। ফলে পূর্ব স্থানীয় ও স্থানীয় মানুষজনের বিশেষ কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় বন পার্শ্ববর্তী মানুষেরা জীবিকার জন্য বনসম্পদ আহরণ করার তাগিদে বনের ক্ষতিসাধন করতে থাকে কখনও বা বনভূমি অধিকার করে ক্রমশ কৃষিজমিতে রূপান্তর করতে থাকে। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার বনভূমি অধিকার করতে থাকে। এবং স্বাধীনতার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবার জন্যে দুর্গম অরণ্য অঞ্চল সুগম হবার ফলে একশ্রেণির কাঠ ট্রাকযোগে পাচার হতে থাকে। নানাদিক থেকে এসে বহু মানুষ রাস্তার ধারে বসবাস শুরু করায় তাদের জীবিকার জন্য বন থেকে জ্বালানি বা অন্য বনজ দ্রব্য আহরণ করে এবং তাদের গৃহপালিত পশু বনে বিচরণ করতে থাকে। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বনের উপর চাপ সৃষ্টি হবার দরুণ বন ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করি উত্তরবঙ্গে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ছিল অতি দুর্গম, ক্রমশ উন্নয়নের প্রয়োজনে বিভিন্ন রাস্তা হবার ফলে এবং উত্তরোত্তর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ বা রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে জীবনযাত্রার জন্য ঐ অঞ্চলে বনের ধারে বসবাস শুরু করে এবং জীবিকার জন্য তারা বনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ফলে বনের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস (Degraded) হতে থাকে। অপরদিকে দক্ষিণবঙ্গে লালমাটি অঞ্চলে বা পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 'Degraded forest'-এর উপর নির্ভরশীল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন। এই সব বনভূমিতে মূলত দ্রুতবর্ধনশীল

গাছ লাগিয়ে বনায়ন আরম্ভ হয় ছয়ের দশকে। কিন্তু এই প্রকল্পও বিভিন্ন বিধিনিষেধের ফলে একদিকে বনজ দ্রব্য আহরণের পরিমাণ সঙ্কুচিত হতে থাকে অপরদিকে এই অঞ্চলের মানুষ ও আদিবাসীদের দ্বারা বনধ্বংস অব্যাহত থাকে কেননা এখানকার বনসম্পদই তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের অপরাবাড়ি অঞ্চলে জনৈক বন আধিকারিক অজিত ব্যানার্জী বন পরিচালনার জন্য একটি যুগান্তকারী অনুসন্ধান সংঘটিত করেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট বনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের দ্বারা বনরক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং কৃতকার্য হন। এই ব্যবস্থা 'Participationg Forest Manangement বা Joint Forest Mangement বলে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় বনের পাশ্ববর্তী অধিবাসীরা বনরক্ষার ফলে যে বনসৃজন বা প্রাকৃতিক বন্যের উৎপাদন হবে তার শতকরা ২৫ ভাগ এবং বনজদ্রব্যাদি জীবিকার জন্য পাবে। ক্রমে এই ধরনের পরীক্ষা (Experiment) পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে করা হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। ভারত সরকার Joint Forest Management ভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে অনুমোদনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ শুরু হয়।

১৯৮০ সালে ভারত সরকার ক্রমবর্ধমান বনভূমি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার রোধ করতে Forest Conservation Act চালু করেন, যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিনানুমতিতে বনভূমি অন্যকাজে (Non Foresty) ব্যবহার করা যাবে না। সংবিধানে যে বনভূমির উপর রাজ্যের একমাত্র অধিকার ছিল তা Concurent List-এ রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে বনের জমি বন ছাড়া বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের একটি হিসেব দেওয়া হল যা centre for science and Environment-এর রিপোর্টে পাওয়া যায়—২০০৯ সাল পর্যন্ত বনভূমি জমি ৮৭৮৮৪ হেক্টর বনভূমি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার হয়। তার মধ্যে ৩১% কৃষির জন্য দখল হওযা জমি, ১৪% সেচের জন্য, বিদ্যুৎ প্রকল্পের (Power Prject) জন্য ১৩.৭% এবং খনিজ কাজের জন্য ১২.৪% জমি।

বনসংরক্ষণ বা বন-ব্যবহার বিষয় বনবিভাগের মধ্যেই সীমিত ছিল। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রাজনীতিক বা জনসাধারণের বিশেষ হস্তক্ষেপের উল্লেখ দেখা যায় না। যদিও ব্রিটিশ আমলে কোন কোন বন সংরক্ষণের ব্যাপারে স্থানীয় অরণ্যবাসীদের আন্দোলন হয়েছিল, অবশ্য তার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলনা। পশ্চিমবঙ্গে সাতের দশকে বামেরা বনশ্রমিকদের কিছু দাবি নিয়ে যে আন্দোলন করে তা ফলে পূর্বনিয়মে শ্রমিকদের বনের চাষের জমি, বাসস্থান ও বনসৃজনের সঙ্গে চাষ করার সুযোগের জন্য বিনানুমতিতে ১৮০দিনের কাজের দায়িত্ব ছিল তা পরিবর্তিত হওয়ার সুবাদে পূর্ববর্তী বেগারি প্রথার অবসান হয়।

সাতের দশকে উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে জলবিভাজিকা অঞ্চলে গাছকাটার প্রতিবাদ

স্বরূপ চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এভাবে ক্রমশ সাধারণের মধ্যে বনসংরক্ষণের উৎসাহ দানা বেঁধে ওঠে। ক্রমে জনসাধারণ ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংসের প্রতিবাদ শুরু করে। ২০১০ সালে ভারত সরকার Green Tribunal Act পাশ করে যার লক্ষ্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিচার করা। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে সংরক্ষিত বনের বাইরে গাছ কাটা নিরোধক আইন চালু হয়।

১৯৭১ সাল থেকে UNESCO-র ম্যান ও বায়োস্পেয়ার কর্মসূচি.(Man O Biosphere Programme), মানুষ ও প্রকৃতি বিষয়ক বিশেষ গবেষণা শুরু হবার পর থেকে বিশ্বরাজনীতিতে ইকোলজি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। ১৯৭২ সালে স্টকহলমে প্রথম পরিবেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই আলোচনাচক্রে বিশ্বের উন্নয়ন চিরায়ত করা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি যা অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বের নানা ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করতে চলেছে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। ১৯৯২ সালে রিয়োতে প্রথম উন্নয়ন চিরায়ত করার লক্ষ্যে চিন্তাভাবনার জন্য বিশ্ব শিখর সম্মেলন (Earth Summit Conference) অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচনান্তে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়।— যেমন, আবহাওয়া পরিবর্তন, খাদ্য ও জলের নিরাপত্তা, বায়োডাইভারসিটি সংরক্ষণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমস্যা ইত্যাদি এবং এই সমস্ত ব্যাপারে অরণ্যের যে বিশেষ ভূমিকা আছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়। ক্রমবর্ধমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ফলে সমস্যা নিবারণ করার জন্যে ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটোতে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র যোগদান করে। কিয়োটো প্রোটোকল একটি 'International Treaty' ঘোষণা করে। এই Treaty 'International Frame Work Convention of Climate Change' বলে পরিচিত। কিয়োটোতে ১৯৯৭ সালের ১১ জানুয়ারি যে প্রাথমিক (প্রথম) আলোচনা হয় তাতে স্থির হয় Co_2 emission কমিয়ে ১৯৯০ সালের Concentration থেকে ৫.২% কম করতে হবে। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশ সহমত পোষণের (Negotiation) জন্য আলোচনা হচ্ছে। যেমন প্যারিসে ৩০.১১.১৫ থেকে ১১.১২.১৫ পর্যন্ত। আশার কথা ভারতে বন পরিমাণ বর্তমানে ২১.৩৪% এবং ঘনবনের পরিমাণ ২০১৩ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছ এবং ক্ষয়িষ্ণু বন PPP মডেলে বনায়ন করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি ব্রিটিশ আমল থেকে স্বাধীনতার পরবর্তীকাল পর্যন্ত বনজাত পণ্যের জন্য বনের গুরুত্ব থাকায় ভারত সরকারের বনমন্ত্রক কৃষি বিভাগের অঙ্গ ছিল। ক্রমশ পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বনের ভূমিকার গুরুত্বের জন্য পৃথক বন ও পরিবেশ মন্ত্রক ও বর্তমানে মন্ত্রকের নাম বন, পরিবেশ ও আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়ক (Forest, Environment and Climate Change).